



কপোতাক্ষ নদ

মাইকেল মধুসূদন দত্ত



কবি পরিচিতি

১৮২৪ খ্রিস্টাব্দের ২৫ জানুয়ারি যশোর জেলার সাগরদাঁড়ি গ্রামে মাইকেল মধুসূদন দত্ত এক ধনী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম রাজনারায়ণ দত্ত এবং মাতা জাহ্নবী দেবী। মধুসূদনের প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয় সাগরদাঁড়ির গ্রামের পাঠশালায়। শৈশবেই তিনি ইংরেজি ভাষায় ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। অতঃপর তিনি কলকাতার হিন্দু কলেজে ভর্তি হন। এ সময় তিনি ডিরোজিও প্রভাবিত ইয়ং-বেঙ্গল দল দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হন। বাল্যকাল থেকেই মধুসূদন ইংরেজি কবিতার প্রতি বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। বিলেতে গিয়ে তিনি বড় কবি হবেন এ-ই ছিল তাঁর বাল্যের স্বপ্ন। এ উদ্দেশ্যেই ১৮৪২ খ্রিস্টাব্দে তিনি খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেন এবং তাঁর নামের প্রথমে যোগ হয় ‘মাইকেল’। ১৮৬২ সালে মধুসূদন ইউরোপ যান। তিনি লন্ডনে ব্যারিস্টারি পাস করেন। লন্ডন থেকে তিনি ফ্রান্সের ভার্সাই নগরীতে যান ও বেশ কয়েক বছর অবস্থান করেন। প্রথমে ইংরেজি ভাষায় কবিতা রচনা আরম্ভ করলেও কিছুদিনের মধ্যেই তিনি বাংলা ভাষার প্রতি অনুরাগী হয়ে ওঠেন এবং বাংলা ভাষায় সাহিত্যচর্চা করে রেখে যান অক্ষয় অবদান। বিষয় ভাবনা, জীবনার্থ এবং প্রকরণ-শৈলীর স্বাতন্ত্র্যে মধুসূদনের রচনা আধুনিকতার শিখরস্পর্শী। অমিত্রাক্ষর ছন্দরীতির আবিষ্কার ও ‘মেঘনাদবধ কাব্য’ রচনা তাঁর অমর কীর্তি। মহাকাব্য, সনেট, পত্রকাব্য, প্রহসন, ট্রাজেডি নাটক ইত্যাদি সাহিত্যশাখা বাংলা সাহিত্যে তিনিই প্রথম প্রবর্তন করেন। ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দের ২৯ জুন কলকাতার আলিপুর জেনারেল হাসপাতালে মাইকেল মধুসূদন দত্ত শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা :

কাব্যগ্রন্থ :	তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য, মেঘনাদবধ কাব্য, বীরঙ্গনা কাব্য, চতুর্দশপদী কবিতাবলী;
নাটক :	পদ্মাবতী, শর্মিষ্ঠা, কৃষ্ণকুমারী;
প্রহসন :	একেই কি বলে সভ্যতা?, বুড়ো সালিকের ঘাড়ে রৌঁ;
গদ্য-কাব্য :	হেকটর-বধ (অসমাপ্ত)।

ভূমিকা

বাংলা কাব্য-সাহিত্যে মাইকেল মধুসূদন দত্তের ‘চতুর্দশপদী কবিতাবলী’ নামক সনেট কাব্য থেকে ‘কপোতাক্ষ নদ’ কবিতাটি সঙ্কলিত হয়েছে। এ কবিতায় কবির শৈশবে দেখা কপোতাক্ষ নদের প্রতি ভালোবাসার অন্তরালে স্বদেশপ্রেমের বিষয়টি প্রকাশিত হয়েছে। সাময়িক মোহে পাশ্চাত্য সাহিত্যে আত্মপ্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হয়ে প্রবাস জীবনে স্বদেশের প্রতি অনুরাগের স্বরূপ তাঁর স্মৃতি বিজড়িত বর্ণনায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কবির আকূল আকুতি কপোতাক্ষ নদ যেন তাঁর স্বদেশের প্রতি হৃদয়ের কাতরতা বঙ্গবাসীর নিকট ব্যক্ত করে।



উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়া শেষে আপনি—

- সনেট কবিতার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন;
- কবির ভাষাপ্রেম ও দেশপ্রেমের স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।



মূলপাঠ

সতত, হে নদ, তুমি পড় মোর মনে !
 সতত তোমার কথা ভাবি এ বিরলে;
 সতত (যেমতি লোক নিশার স্বপনে
 শোনে মায়া-মন্ত্রধ্বনি) তব কলকলে
 জুড়াই এ কান আমি ভ্রান্তির ছলনে !
 বহু দেশে দেখিয়াছি বহু নদ-দলে,
 কিন্তু এ স্নেহের তৃষ্ণা মিটে কার জলে?
 দুষ্ক-স্রোতোরূপী তুমি জন্মভূমি-স্তনে ।

আর কি হে হবে দেখা? – যত দিন যাবে,
 প্রজারূপে রাজরূপ সাগরেরে দিতে
 বারি-রূপ কর তুমি; এ মিনতি, গাবে
 বঙ্গজ জনের কানে, সখে, সখা-রীতে
 নাম তার, এ প্রবাসে মজি প্রেম-ভাবে
 লইছে যে তব নাম বঙ্গের সংগীতে ।



নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা :

কর- খাজনা; রাজস্ব। কলকলে- নদীর কলকল আওয়াজে। নিশা- রাত্রি; রাত। বঙ্গজ জন- বঙ্গে জন্মেছেন যিনি, বাঙালি। বঙ্গের সঙ্গীতে- বাংলার গানে। বারি- পানি। বারি-রূপ কর- জল রূপ খাজনা, প্রজা যেমন রাজাকে কর বা রাজস্ব দেয় তেমনি কপোতাক্ষ নদও সাগরকে জলরূপ কর বা রাজস্ব দিচ্ছে। বিরলে- একান্ত নিরিবিলিতে। ভ্রান্তি- ভুল। ভ্রান্তির ছলনে- ভুলের ছলনায়। মিনতি- প্রার্থনা। যেমতি- যেমন। সখা-রীতে- বন্ধুর রীতিতে; বন্ধুর নিয়মে। সতত- সর্বদা; সবসময়।

চতুর্দশপদী কবিতা- ইংরেজিতে Sonnet, বাংলায় চতুর্দশপদী কবিতা। গীতিকবিতার যে রূপটি চৌদ্দ চরণ এবং চৌদ্দ মাত্রার সমন্বয়ে গঠিত হয় তাকে চতুর্দশপদী কবিতা বা সনেট বলে। চতুর্দশপদী কবিতার প্রথম আট চরণের স্তবককে অষ্টক (Octave) এবং পরবর্তী ছয় চরণের স্তবককে ষষ্টক (Sestet) বলে। অষ্টকে মূলত ভাবের প্রবর্তনা এবং ষষ্টকে ভাবের পরিণতি থাকে। চতুর্দশপদী কবিতায় কয়েক প্রকার অন্ত্যমিল প্রচলিত আছে। যেমন, প্রথম আট চরণ : কখখক কখখক। শেষ ছয় চরণ : ঘঙচ ঘঙচ। অথবা প্রথম আট চরণ : কখখগ কখখগ, শেষ ছয় চরণ : ঘঙঘঙ চচ। ‘কপোতাক্ষ নদ’ একটি চতুর্দশপদী কবিতা। এখানে মিলবিন্যাস : কখকখকখখক গঘগঘগঘ।



সারসংক্ষেপ :

বিদেশে বসে দেশের নদী কপোতাক্ষের কথা কবির মনে পড়ে। বহু দেশের বিচিত্র নদী কবি দেখেছেন। কিন্তু ওই নদীর তুলনা আর কোথাও পাননি। তাঁর কাছে এ নদী মায়ের দুধের মতো তৃপ্তিদায়ক। কবির আশঙ্কা, তাঁর সাথে কপোতাক্ষের আর দেখা নাও হতে পারে। কবির আকুতি : বিদেশে বসেও কবি যে দেশের নদীরই গান গাইছেন, কপোতাক্ষ যেন বাংলার মানুষকে সে কথাটা জানায়।



পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

- সনেটের বৈশিষ্ট্য কী?
 ক. আট চরণ, চৌদ্দ মাত্রা খ. ছয় চরণ, ছয় মাত্রা গ. চৌদ্দ চরণ, চৌদ্দ মাত্রা ঘ. আট চরণ, আট মাত্রা
- ‘কপোতাক্ষ নদ’ কবিতায় যাকে ‘রাজ’রূপে কল্পনা করা হয়েছে-
 ক. সাগরকে খ. কবিকে গ. জন্মভূমিকে ঘ. স্বদেশকে



নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

‘কোথায় হারিয়ে গেল সোনালী বিকেলগুলো সেই—
আজ আর নেই।’

৩. উদ্দীপকে প্রকাশিত অনুভূতি নিচের কোন রচনায় ফুটে উঠেছে?

ক. আমার সন্তান খ. পল্লিজননী গ. কপোতাক্ষ নদ ঘ. মানুষ

৪. ‘কপোতাক্ষ নদ’ ও উদ্দীপকের অনুভূতির যে বিষয়ে মিল রয়েছে—

i. স্নেহকাতরতা ii. স্মৃতিকাতরতা iii. মানবপ্রেম

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii. গ. iii ঘ. i ও ii



চূড়ান্ত মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

৫. মধুসূদন দত্ত কত সালে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেন?

ক. ১৮৪১ খ. ১৮৪২ গ. ১৮৪৩ ঘ. ১৮৪৪

৬. ‘বঙ্গ জনের কানে’ এখানে ‘বঙ্গ জন’ বলতে কবি বুঝিয়েছেন—

i. বাংলার প্রবাসী জনগণকে ii. বাংলায় নিবাসী জনগণকে iii. বাংলাভাষী ভিনদেশী জনগণকে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii গ. iii ঘ. i ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

হে বঙ্গ ভাঙারে তব বিবিধ রতন

তা সবে অবোধ আমি অবহেলা করি।

৭. উদ্দীপকের আঙ্গিকের সঙ্গে নিম্নের কোন কবিতার মিল রয়েছে?

ক. স্বাধীনতা খ. মানুষ গ. পল্লিজননী ঘ. কপোতাক্ষ নদ

৮. উদ্দীপক ও ‘কপোতাক্ষ নদ’ কবিতায় প্রকাশিত হয়েছে—

ক. দেশপ্রেম খ. প্রকৃতিপ্রেম গ. মানবপ্রেম ঘ. বাৎসল্যপ্রেম

সৃজনশীল প্রশ্ন :

লাবণ্যকে উচ্চশিক্ষার্থে ম্যাসাচুসেটস্ সিটিতে শিকড় গাড়তে হয়। সেখানকার পরিবেশে সে এখনো খাপ খাইয়ে উঠতে পারেনি। সারাক্ষণ তার অন্তর পড়ে থাকে দেশে অবস্থানরত মা-বাবা আর স্বজনদের নিকট। প্রবাসে জন্মভূমি বাংলার প্রকৃতি তার চোখ জুড়ে স্নেহের পরশ বুলিয়ে যায়। বাংলা গান না শুনলে তার চোখে ঘুম আসে না। এভাবে শয়নে-স্বপনে দেশ এবং দেশের মানুষগুলো তার নিকট স্বপ্নময় হয়ে ওঠে।

ক. মাইকেল মধুসূদন দত্তের অমর কীর্তি কোনটি?

খ. ‘চতুর্দশপদী কবিতা’ বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

গ. উদ্দীপকের লাবণ্যের সঙ্গে ‘কপোতাক্ষ নদ’ কবিতার কবির সাদৃশ্য কোথায়? —ব্যাখ্যা করুন।

ঘ. “লাবণ্য ও কবির ভাবানুভূতির অন্তরালে কাজ করেছে গভীর দেশপ্রেম।” —উদ্দীপক ও ‘কপোতাক্ষ নদ’ কবিতার আলোকে মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করুন।



নমুনা উত্তর : সৃজনশীল প্রশ্ন

ক. মাইকেল মধুসূদন দত্তের অমর কীর্তি ‘মেঘনাদবধ কাব্য’।

খ. গীতিকবিতার যে রূপটি চৌদ্দ চরণ এবং চৌদ্দ মাত্রার সমন্বয়ে গঠিত হয় তাকে চতুর্দশপদী কবিতা বা সনেট বলে।

সনেট কখনো চৌদ্দ চরণের কম বা বেশি হয় না। প্রতিচরণে সাধারণত চৌদ্দটি মাত্রা ব্যতিক্রম হিসেবে আঠারো মাত্রা থাকে। সনেটের প্রথম আট চরণের স্তবককে বলা হয় অষ্টক এবং শেষ ছয় চরণের স্তবক বলা হয় ষটক। প্রথম স্তবকে



অর্থাৎ অষ্টকে থাকে ভাবের বিস্তার, আর শেষ স্তবকে অর্থাৎ ষটকে থাকে ভাবের পরিসমাপ্তি। বাংলা সাহিত্যে মাইকেল মধুসূদন দত্তই প্রথম সনেট জাতীয় কবিতার প্রবর্তন করেন।

- গ. স্বদেশ ও জন্মভূমির প্রতি অনুভূতির দিক দিয়ে কবি মধুসূদন ও লাভণ্যের মধ্যে সাদৃশ্য দেখা যায়। স্বদেশপ্রেম একটি অশরীরী অনুভূতি। পৃথিবীর সকল মানুষই জন্মভূমির মাটি, মানুষ, প্রকৃতিকে ভালোবাসে। পৃথিবীর প্রত্যেক মানুষই স্বদেশের জন্য বিরহ বেদনা অনুভব করে। ‘কপোতাক্ষ নদ’ কবিতায় কবি ও উদ্দীপকের লাভণ্যের মধ্যে আমরা সেই অকৃত্রিম দেশপ্রেমের চিত্রই দেখতে পাই।
- উদ্দীপকের লাভণ্য ম্যাসাচুসেটস্ সিটিতে উচ্চশিক্ষার জন্য পাড়ি জমায়। সেখানে তার কিছুই ভালো লাগে না। সবসময় তার মন পড়ে থাকে দেশে মা-বাবা আর স্বজনদের নিকট। বাংলার প্রকৃতি, বাংলার মানুষ, বাংলার গান তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে। যেমন ‘কপোতাক্ষ নদ’ কবিতায় কবি মধুসূদন প্রবাস জীবনে নিজ দেশের প্রিয় নদীটিকে ভুলতে পারেননি। জীবনের প্রয়োজনে কবি কত দেশে গিয়েছেন, কতো নদী-সরোবর দেখেছেন, কিন্তু তার প্রাণের তৃষ্ণা মেটেনি। একমাত্র কপোতাক্ষ নদের জল তার স্নেহের তৃষ্ণা মেটাতে পারে বলে তিনি মনে করেন। জন্মভূমিকে ভালোবাসেন বলেই কবির মনে এ অনুভূতি কাজ করেছে। বলা যায়, প্রবাস জীবনের আনন্দ-উল্লাস কিংবা ভোগ-বিলাস কবি মধুসূদন কিংবা লাভণ্য কারো কাছে ভালো লাগেনি। উভয়ের কাছে দেশপ্রেম তথা জন্মভূমি প্রীতিই বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। বস্তুত দেশপ্রেমের দিক থেকেই কবি ও লাভণ্যের মধ্যে সাদৃশ্য রয়েছে।
- ঘ. লাভণ্য ও কবি মধুসূদনের গভীর অনুভূতির পেছনে যে বিষয়টি কাজ করেছে তা হচ্ছে অকৃত্রিম দেশপ্রেম। বাস্তব পৃথিবীতে একজন দেশপ্রেমিক মানুষ কখনোই তার দেশকে ভুলতে পারেন না। দেশের মাটি, মানুষ, নদ-নদী, মায়াভরা প্রকৃতি সবকিছুই যেন তাকে ফিরে ফিরে ডাকে। কেবল জন্মভূমির আলো, বাতাস আর পানিতে তার প্রাণের তৃষ্ণা মেটে। বস্তুত এর স্বরূপই ফুটে উঠেছে উদ্দীপক আর ‘কপোতাক্ষ নদ’ কবিতায়।
- উদ্দীপকে আমরা দেখতে পাই লাভণ্য পড়াশোনার জন্য ম্যাসাচুসেটস্-এ গেলেও সেখানে সে মন বসাতে পারে না। তার অন্তর জুড়ে থাকে বাংলার মাটি, মানুষ, প্রকৃতি আর তার আপনজন। সে সারাক্ষণ অন্তরে অনুভব করে বাংলার মমতাময়ী রূপকে। তার জন্মভূমি বাংলা যেন তাকে সবসময় হাতছানি দিয়ে ডাকে। কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের ‘কপোতাক্ষ নদ’ কবিতায়ও অকৃত্রিম স্বদেশপ্রীতি প্রকাশ পেয়েছে। কবিও জীবনে অনেক দেশ ঘুরেছেন। তিনি ফ্রান্সে গিয়েছেন বড় কবি হওয়ার আশায়। কিন্তু সেখানে তাঁর শৈশব ও কৈশোরের আনন্দ কিংবা বেদনা-বিধুর স্মৃতি সারাক্ষণ কাঁদায়। তিনি আবেগে আপ্ত হন, সুদূর ফ্রান্সে বসেও যেন কপোতাক্ষের কলকল ধ্বনি শুনতে পান। বিদেশের মাটিতে অন্য কোনো জল তাঁর স্নেহের তৃষ্ণা মেটাতে পারে না। একমাত্র কপোতাক্ষ নদের জলই যেন মেটাতে পারে তাঁর অন্তরের অতৃপ্ত তৃষ্ণা। এভাবে কবি দেশের বাইরে গভীরভাবে অনুভব করেন নিজের দেশকে, জন্মভূমিকে। তাই বলা যায়, লাভণ্য ও কবির গভীর জীবন অনুভূতির অন্তরালে কাজ করেছে গভীর দেশপ্রেম।



অ্যাসাইনমেন্ট : নিজে করুন

সৃজনশীল প্রশ্ন: দু’পাশে ধানের ক্ষেত

সরু পথ

সামনে ধুধু নদীর কিনার

আমার অস্তিত্বে গাঁথা। আমি উধাও নদীর

মুখ এক অবোধ বালক।

ক. বাংলা কাব্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তন করেন কে?

খ. ‘ভ্রান্তির ছলনে’ বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন?

গ. উদ্দীপকে ‘কপোতাক্ষ নদ’ কবিতার যে ভাবটি প্রতিফলিত হয়েছে তা তুলে ধরুন।

ঘ. “উদ্দীপকের ভাবটিই যেন কপোতাক্ষ নদ কবিতার মূল সুর।” –আলোচনা করুন।



উত্তরমালা: বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. গ ২. ক ৩. গ ৪. খ ৫. গ ৬. খ ৭. ঘ ৮. ক